بسم الله الرحمن الرحيم

শিউলিমালা

ষাণ্মাসিক শিউলিমালা

সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন

◆ সংখ্যা : ০৩ ◆ জানুয়ারি-জুন, ২০২৩

শিউলিমালা ষাণ্মাসিক

সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন

(শিউলিমালা একাডেমির ষাণ্মাসিক মুখপত্র)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

মুহসিনা বিনতি মুসলিম

উপদেষ্টা সম্পাদক

নাফিসা নাজমী

নাজিয়া তাসনিম

মিমি বিনতে ওয়ালিদ

সম্পাদক

জান্নাত আরা তাবাসসুম

সম্পাদনা সহযোগী

নাজিফা আঞ্জুম

সুমাইয়া তাবাসসুম

নির্ধারিত মূল্য : ১৩০ টাকা

যোগাযোগ : Email : shiulimalaacademy@gmail.com

Facebook, Instragam, Twitter : Shiulimala Academy

Shiulimala : A Half Yearly Journal on Social Thought and Voice of Emancipation. January-June, 2023; Editor : Jannat Ara Tabassum; Fixed Price 130 Taka. Askona, Airport, Dhaka.

সূচিপত্র

■ **সম্পাদকীয়** ০৭

■ **ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্য চিন্তা অধ্যয়ন ও বুঝাপড়া** ১১
রজার গারাউডি
ভাষান্তর : উম্মে আহমেদ

■ **ইসলামে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ** ২৫
সাইয়েদ হোসাইন নসর
অনুবাদ : রাফিয়া জান্নাত

■ **পলাশী : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন** ৪৯
ডক্টর মোহর আলী

■ **ইতিহাসের বহমান ধারায় মুসলিম নারীদের সামাজিক জীবন** ৫৫
ড. খাদিজা গরমেজ
অনুবাদ : বুরহান উদ্দিন

■ **আগামী দিনের ইতিহাস** ৬৩
ড. আলী শরীয়তি
অনুবাদ : মাহমুদ আবদুল্লাহ

- **ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতায় স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ** ৭৮
  রাজিয়া সুলতানা

- **শস্য ব্যবস্থাপনা, অসহায় কৃষক ও রাষ্ট্রীয় সংকট** ৮৬
  নাজিয়া তাসনিম

- **সমাজ সংস্কারক ও জনদরদী শাসক: নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী** ১০৪
  সাবিহা শুচি

- **আকালের সন্ধানে : ক্ষুধার পরম বন্ধু মৃণাল সেন** ১০৯
  উম্মে সাফওয়ান

- **জ্ঞানের পথে যাত্রার অনবদ্য সূচনা : Adventure of knowledge** ১১৫
  জয়নব জামান

- **ওয়ারিশ** ১২৫
  মিমি বিনতে ওয়ালিদ

- **আকুতি ও আহবান** ১৩৪
  সুমাইয়া তাবাসসুম

- **অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার** ১৩৬
  জেবা ফারিহা

সম্পাদকীয়

শিউলিমালা একাডেমি ও এর পত্রিকা *ষাণ্মাসিক শিউলিমালা*, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নরত সচেতন নারী শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজ ও চিন্তাঙ্গনে যুগোপযোগী জ্ঞান, চিন্তা ও আলাপ জারি রাখার একটি অনন্য প্রয়াস।

এই প্রচেষ্টার অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে, জাতীয় চিন্তাবৃত্তের বিবেচনায় নারী অঙ্গনে চিন্তার উন্নয়ন, বিকাশ এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার সৃষ্টি করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে *ষাণ্মাসিক শিউলিমালা* প্রতিনিয়তই প্রচলিত চর্বিত চর্বন এবং ফল বিহীন আলাপের গণ্ডি থেকে বের করে এনে এই দেশ, মাটি, মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি ও সময়কে পাঠ করে বিদ্যমান সংকটকে চিহ্নিত করে এবং এই সমস্যা সমাধানকল্পে যথাযথ উপযোগী উন্নত চিন্তা ও আলাপ প্রবন্ধের ভাষায় হাজির করে। জন্ম দিতে চায় প্রয়োজনীয় নতুন আলাপ ও আলোচনা।

শতভাগ নারীদের দ্বারা পরিচালিত এ অভিনব অগ্রযাত্রা কেবল নারী কেন্দ্রীক আলোচনায় ব্যপৃত হয়, এমনটা নয়। বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র জাতির তরক্কীর জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তা, দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। তবে ১৮ কোটি মুসলিমের এই জনপদের অর্ধেক-নারী অঙ্গনের ভয়াবহ দুর্গতি, ব্যখ্যাতীত পশ্চাতপদতা এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জাতীয় মুক্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে নারীদের ভূমিকা বাতলে দেয়া এবং সে অনুসারে প্রয়োজনীয় চিন্তা ও নির্দেশনা শিউলিমালার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে নিশ্চয়ই।

জ্ঞানতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস সহ তাবৎ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলাপ এবং উন্নত চিন্তার সাথে এ দেশের যুবসমাজকে পরিচিত করে দিতে শিউলিমালা বদ্ধ পরিকর। এর মাধ্যমে শিউলিমালা চায়, জাতীয় মেধা, মনন এবং অভীপ্সাকে মুক্তির বন্দর পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যুবমননে আত্মশক্তির বীজ বুনে দিয়ে জ্ঞান ও হিকমতের ভাষায় তাদের চিন্তা,

যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে গঠন করে একটি স্বপ্নময় যুবসমাজ গঠন করতে। সেই অভিযাত্রায় নারী অঙ্গন থেকে সবচে বড় বড় অবদানগুলো রাখা হবে বলে শিউলিমালা নিরন্তর স্বপ্ন দেখে।

সেই স্বপ্ন প্রয়াসের প্রতিফলন হিসেবে 'সমাজ ভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন' এই স্লোগানকে ধারণ করে ষাণ্মাসিক শিউলিমালার প্রথম দুটি সংখ্যা পাঠক মহলে ব্যপক সমাদৃত হয়েছে। বছর ঘুরে শিউলিমালা একাডেমির মুখপত্র হিসেবে এবার প্রকাশ হতে যাচ্ছে শিউলিমালা তৃতীয় সংখ্যা।

এবারের সংখ্যার প্রতিটি লেখারই অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিভিন্ন অঙ্গনে বিদ্যমান সমস্যার বিশ্লেষণ এবং এর সমাধানে উত্থিত আলাপে জ্ঞানবান পাঠক মাত্রই নিজেকে রিলেট করতে পারবেন। এবং এইসব চিন্তার নিগুঢ় রস সিঞ্চন করে নিজেকে একজন 'মুসলিহ' বা সমাধানকারী ব্যক্তিত্বের কাতারে উন্নীত করতে অভিলাষী হবেন।

এ সংখ্যায় থাকছে প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ও চিন্তাবিদ রজার গারাউডি-এর "ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্য চিন্তা অধ্যয়ন ও বুঝাপড়া" নামক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন উম্মে আহমেদ। সাইয়্যেদ হোসাইন নাসর-এর বক্তব্য "ইসলামে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ" অনুবাদ করেছেন তরুণ চিন্তক ও লেখক শ্রদ্ধেয় রাফিয়া জান্নাত। থাকছে ডক্টর মোহর আলীর অনবদ্য প্রবন্ধ, পলাশী: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন।

'ইতিহাসের বহমান ধারায় মুসলিম নারীদের সামাজিক জীবন' শীর্ষক আলোচনা রেখেছেন প্রখ্যাত মুফাসসির ড. খাদিজা গরমেজ, অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় বুরহান উদ্দিন আজাদ। থাকছে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ড. আলী শয়তীর প্রবন্ধ 'আগামী দিনের ইতিহাস'। অনুবাদ করেছেন মাহমুদ আব্দুল্লাহ।

'ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতায় স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক গবেষণা সংকলন করেছেন রাজিয়া সুলতানা। 'শস্য ব্যবস্থাপনা, অসহায় কৃষক ও রাষ্ট্রীয় সংকট' নামে পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রদ্ধেয় নাজিয়া তাসনিম।

এছাড়াও তরুণ চিন্তক ও লেখকদের মধ্যে 'সমাজ সংস্কারক ও জনদরদী শাসক: নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী' লিখেছেন সাবিহা শুচি। সিনেমা পর্যালোচনায় 'আকালের সন্ধানে : ক্ষুধার পরম বন্ধু মৃণাল সেন' নিয়ে আলাপ করেছেন উম্মে সাফওয়ান। বহুল পঠিত Adventure of knowledge গ্রন্থটির পর্যালোচনা এবং জ্ঞানের পথে যাত্রা নিয়ে লিখেছেন জয়নব জামান।

হৃদয়গ্রাহী গল্প লিখেছেন 'ওয়ারিশ' নামে মিমি বিনতে ওয়ালিদ। এছাড়াও থাকছে সুমাইয়া তাবাসসুম ও জেবা ফারিহার কবিতা।

তরুণ লেখক, অনুবাদক ও চিন্তকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত এ পত্রিকার প্রতিটি পাতাই যেন হয়ে ওঠে এদেশের নিমজ্জমান যুবসমাজ পুনরুদ্ধারে এক একটি আশার স্তবক। পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলোর নিয়মিত অধ্যয়ন, চর্চা, আড্ডা পাঠক মহলকে দারুনভাবে উপকৃত করবে বলে আমরা আশাবাদী।

ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্য চিন্তাদর্শন অধ্যয়ন ও বুঝাপড়া

রজার গারাউডি
অনুবাদ : উম্মে আহমেদ

আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা তার মূলের মধ্যেই আবদ্ধ, কারণ এটি এখনো তার সূচনালগ্নের অনেকগুলো প্রশ্নেরই জবাব দেয়নি। প্রশ্নগুলো হচ্ছে, জীবনের অর্থ কী? মৃত্যু মানে কী? স্বাধীনতার অর্থ কী এবং তার উৎস কী? স্রষ্টার আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কাজ করবো? দর্শনের এই জরুরী প্রশ্নগুলো কেবল মানুষের মধ্য থেকেই উঠে আসে। কারণ মানুষ প্রশ্ন করা ছাড়া বাঁচতে পারে না।

প্রকৃতির প্রতিটি সত্তারই একটি স্থান, একটি ক্রিয়াশীলতা (ফাংশন) রয়েছে যা তার নিজের বাছাই করা নয়। প্রতিটি সৃষ্টিই তার স্রষ্টার আইনের অধীন। যেমন, একটা পাথর উপর থেকে ছেড়ে দিলে অবশ্যই নিচে পড়ে যাবে, একটা চারার যত্ন নিলে সেটা বেড়ে উঠবে, একটি প্রাণী অবশ্যই তার সহজাত প্রবৃত্তি অনুসরণ করে চলবে। সবাই-ই এই প্রাকৃতিক আইন কোনো প্রকার বাছাই করা কিংবা প্রশ্ন করা ছাড়া অনুসরণ করে থাকে।

তবে যাইহোক, মানুষকে নিয়ে একটি নতুন জগত শুরু হয়। যে জগতে মানুষই একমাত্র সৃষ্টি, যাকে স্রষ্টা এমন স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সে একটি নিরপেক্ষ, ইচ্ছামতো বা দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে স্রষ্টার অনুগত হতে পারে কিংবা চাইলে অবাধ্যও হতে পারে। আল-কোরআন বলছে, "আমি এ আমানতকে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির উপর পেশ করি, তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ একে বহন করেছে। নিঃসন্দেহে সে বড় জালেম ও অজ্ঞ।" (সূরা আহযাব- ৭২)

এভাবে মানব ইতিহাসের শুরু হয়, এমন ইতিহাস যা মানুষ নিজেই তৈরি করে। অন্যান্য প্রাণীর মতো নয়, যারা প্রয়োজনীয়তার আইন মেনে চলে। এই হারানো ঐক্য ফিরে পাওয়ার জন্য, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির সাথে নিজেকে একীভূত করার জন্য এবং ঐশী দর্শনের আলোকে জীবন ও মৃত্যুর একটা যথার্থ মিনিং দাঁড় করানোর জন্য মানুষ সকল ধরনের মিথ (পৌরাণিক কাহিনী) সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে আবার প্রত্যেক জাতির নবীগণ কর্তৃক আনীত ঐশী সহায়তাও পেয়েছিলো।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, মেসোপটেমিয়া এবং মিসরের মহা পৌরাণিক কাহিনী, ভারতীয় উপনিষদের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী, চীনাদের তাওবাদ (Taoism) এই মতবাদগুলো বিশ্বের চূড়ান্ত বাস্তবতা এবং এর অর্থ ও তাৎপর্যের মৌলিক সমস্যাবলী, এ ব্যপারে আমাদের ভূমিকা এবং আমাদের সম্ভাব্য কর্মগুলো সমগ্র এশিয়া জুড়ে জাগিয়ে তোলে এবং বিবেচনা করা শুরু করে।

মানুষ ও প্রকৃতি এবং মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে একটি সন্তোষমূলক জবাবে পৌঁছার জন্য এটা ছিলো মানুষের প্রথম প্রচেষ্টা। নিকট প্রাচ্যে (যেখানে ঐশীবাণী নাযিল হয়েছিলো, সেখানে মানুষের এসব প্রশ্নের ঐশী জবাব দেওয়া হয়েছিলো) প্রজ্ঞাবান লোকেরা গভীর মনোযোগের সাথে মৌলিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেছিলো। তাদের একজন ছিলেন হেরাক্লিটাস, তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই ঘোষণা করেছিলেন-

"সকল কিছুই এক।"
"তাই নিয়ম হচ্ছে সকল কিছুকে সেই 'এক'কে অনুসরণ করা।"
"প্রজ্ঞা শুধু একটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ এমন চিন্তাকে জানা যা সবকিছুকে আদেশ করে ও পরিচালনা করে।"

একইভাবে, হানিফগণও (একনিষ্ট মানুষ) স্রষ্টার ইচ্ছা অন্বেষণের ক্ষেত্রে হেরাক্লিটাসের জবাবগুলোর কাছাকাছি এসেছিলো।

এই পরিস্থিতিতেই পাশ্চাত্যের প্রথম "বিচ্ছিন্নতা" (কোনো বিষয়কে প্রত্যাহার করা) এসেছিলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ঝোঁকের কারণে মানুষ দাসদের দিয়ে প্রকৃতি চাষাবাদ করার বিষয়টি হারিয়ে ফেলে। একইভাবে, শহরগুলোতে, শহরের নাগরিকদের মধ্যে বাণিজ্যের প্রতি তীব্র প্রতিযোগিতা মানুষকে ঐশ্বরিক ঐক্যের দৃষ্টিশক্তি হারাতে বাধ্য করে।

তখনকার সময়ে ফ্যাশন ছিলো যেকোনো পরম জিনিসকে অস্বীকার করা, মানুষের আত্ম-নির্ভরতার উপর অনুমান দাঁড় করানো এবং নিজেকে "সকল কিছুর পরিমাপক" মনে করা। তারা একযোগে ট্র্যানসেনডেন্স (অতিক্রম করার ধারণা) ও উম্মাহর ধারণাকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র বানিয়েছিলো, যা তাদের বিকশিত হওয়ার ইচ্ছা এবং ক্ষমতার প্রতি আকাঙ্ক্ষার কারণে ঘটে।

পাশ্চাত্যের প্রথম দিকের দার্শনিক, এথেন্সের সোফিস্টগণ আমাদেরকে এই নৈতিকতার প্রথম সূত্র দেয়। তারা বলে, 'ভালো' হচ্ছে সবচাইতে শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে গঠিত এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করায় উপায়। স্পষ্ট যে, জঙ্গলের এই আইনটি পাশ্চাত্যের বিকাশ এবং "সন্ত্রাসের ভারসাম্য" বজায় রাখার জন্য আজও অব্যাহত রয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে দর্শনের জন্ম এমনই ছিলো। এটি ছিলো এমন একটি উপলক্ষ্য যা সক্রেটিসকে নৈতিক জ্ঞানের জন্য নতুন ভিত্তি খোঁজার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তিনি মনে করেছিলেন, এটা এথেন্সের আসন্ন বিশৃঙ্খলা ও পতন এবং এর সম্পূর্ণ নৈতিক অবক্ষয় থেকে মানুষকে রক্ষা করবে। তিনি দেখেছিলেন, সমস্যাটি ছিলো কোনো জিনিসের মূল্য বিচার করার জন্য একটি মূলনীতি খুঁজে বের করা, এমন একটি মূলনীতি যা সফিস্টদের উত্থাপিত প্রদত্ত ঘটনাবহুল জবাবগুলোর বিন্যাসকে প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট কার্যকর ছিলো।

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুণ্য এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের অনুসন্ধানকে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। কিন্তু তার মতে, সেই বিজ্ঞানে যুক্তি ও ধারণাগুলোকে একত্রে প্রয়োজনীয় ও অটুট বন্ধনে যুক্ত করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের এই ধারণা বিশ্বাসের (ঈমান) জন্য কোনো জায়গা রাখেনি, যা একটি হীনমন্য জ্ঞানের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। এটা ভালোবাসার জন্যও কোনো জায়গা রাখেনি। কারণ, 'প্লেটোনিক ভালোবাসা' নামে যা পরিচিত, সেটা অন্য মানুষের জন্য ভালোবাসা নয়; বরং সেটা ছিলো পূর্ণ সত্যের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান। সৌন্দর্যের জন্যও এটি কোনো জায়গা রাখেনি। অবশ্য, প্লেটো তার আদর্শিক প্রজাতন্ত্র থেকে কবিদের তাড়া করেছিলেন, কারণ তিনি কবিদের সৃজনশীল কল্পনাশক্তিকে তার প্রতিষ্ঠিত সিস্টেমের জন্য হুমকি মনে করেছিলেন।

যুক্তির এই হ্রাসবাদী ধারণা, যা মানুষকে তার সর্বোৎকৃষ্ট ডাইমেনশন (বিশ্বাস, প্রেম, সৌন্দর্য) থেকে বঞ্চিত করে, আত্মাকে শরীর থেকে, ইন্দ্রিয়কে বোধগম্যতা থেকে মৌলিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং এখনো এটাই পাশ্চাত্য সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

গ্রিক দার্শনিকদের এই দর্শন চর্চা, এটা এমন এক ধরনের যুক্তিবাদ, যা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাগুলোকে (বিশ্বাস, প্রেম, সৌন্দর্য) দুর্বল করে দেয়। এই দর্শনের যে দ্বৈততা (আত্মা ও শরীর এবং ইন্দ্রিয় ও বোধগম্যতা) এটা প্লেটো ও এরিস্টস্টলের যুগ থেকেই তাদের দর্শনে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে এসেছে। তবুও, এটা গ্রিক দর্শনের নাম করে ধর্মকে দুর্বল করে দিয়েছে, যেমনটা ইহুদি ধর্মে হয়েছে ইবনে মাইমুনের হাত ধরে, খ্রিষ্টান ধর্মে সেইন্ট থমাস একুইনাসের হাত ধরে এবং ইসলাম ধর্মে ইবনে রুশদের হাত ধরে।

একটা সময় ছিলো যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা যুক্তি বা আকলের এই হ্রাসবাদী ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলো। সেই মুহূর্তটা এসেছিলো যখন কুরতুবাহ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১০ম শতাব্দী থেকে ১৩ম শতাব্দী সময়ের মধ্যে) একটি নতুন ভিশন ইউরোপকে আলোকিত করে। ইসলামের এই উত্থানে পাশ্চাত্যের হ্রাসবাদী ধারণার বিপরীতে যুক্তি বা আকলকে পূর্ণ মাত্রায় শেখানো ও চর্চা করা শুরু হয়। এটি কয়েক ধাপে ঘটে।

প্রথমত, প্রকৃতি বিজ্ঞান পরীক্ষামূলক পদ্ধতির চর্চা শুরু করে এবং এর মাধ্যমে আরব-ইসলামী চিন্তাকে গ্রিকদের অনুমান নির্ভর চিন্তাধারা থেকে দূরে সরে যেতে সক্ষম করে তোলে। যখন সেই বিজ্ঞান মধ্যযুগে ইউরোপে আসে, তখন এটি স্কলাস্টিসিজমে (মধ্যযুগীয় দর্শন) অধঃপতিত হয়। ইসলামের পরীক্ষামূলক ও গাণিতিক বিজ্ঞান মুসলমানদেরকে প্রয়োজনীয় কার্যকরণের যে শিকল, সেগুলোর মধ্যে সম্পর্কের একটি নতুন সিস্টেম আবিষ্কার করতে সক্ষম করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী দর্শন (যা উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলে, বিপরীতে বিজ্ঞান যেখানে কারণ নিয়ে কথা বলে) কোরআনের শিক্ষা দিয়ে প্রতিটি বস্তুর ভূমিকা কী হবে, প্রতিটি ঐশী নিদর্শন ও কাজের ভূমিকা কী হবে, তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ছিলো। ইসলামী দর্শন ঐশ্বরিক পরিকল্পনায় ঘটছে এমন বিষয় ও ঘটনাগুলোকে নির্ধারণ করার মাধ্যমে জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য পুনরুদ্ধারের জন্য একটি চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলো।

তৃতীয়ত, মুসলমানরা ঈমানকে বিজ্ঞান বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখেনি; বরং তাদের কাজের ধারাবাহিকতা এবং পরিপূর্ণতার মূল মাধ্যম হিসেবে দেখেছে। কারণ (Cause) থেকে প্রভাবে (Effect) যাওয়া এবং প্রভাব থেকে আরেকটি নতুন কারণের দিকে যাওয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান কখনই একটি প্রথম এবং সন্তোষজনক কারণে পৌঁছাতে পারেনি। একইভাবে, দর্শন প্রান্ত থেকে প্রান্ত এবং উদ্দেশ্য থেকে উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে, কখনই নিজে থেকে চূড়ান্ত পরিণতি বা চূড়ান্ত কোনো উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারেনি।

এই অর্থে, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক অনুসন্ধানের জন্য স্ব-প্রমাণিত সত্য ও প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে পারলে 'ঈমান' বিজ্ঞান ও জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিণতি বা চূড়ান্ত ক্ষেত্র হতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে, ঈমান বা বিশ্বাস হচ্ছে সকল সীমা বহির্ভূত যুক্তি।

ইসলামের এই সমৃদ্ধির পরিবর্তে পাশ্চাত্য আরেকটি নতুন ধারা সৃষ্টি করতে শুরু করে। যা দাঁড়ায় রজার বেকন, রেনে দেকার্তে এবং অগাস্ট কোঁৎ এর মাধ্যমে।

রজার বেকন, যিনি পাশ্চাত্যে প্রকৃতি বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির জনক হিসেবে পরিচিত, তিনি স্বীকার করেন যে, তার অনেকটা গবেষণা ও অর্জন ধার করা হয়েছে ইবনে হাইসামের 'অপটিক্স' এর একটি অনুবাদ থেকে, যিনি কুরতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পড়াতেন। তিনি জ্ঞানার্জনের ইসলামী লিগ্যাসি থেকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানকে আলাদা করেন, যেখানে নৈতিকতা ও বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত ছিলো। একইভাবে, দেকার্তে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, মানুষের উচিত নৈতিকতা ও বিশ্বাসের সমস্যাগুলোকে যুক্তি বা আকলের ক্ষেত্র থেকে আলাদা করা। সংক্ষেপে দেকার্তের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যুক্তি কিংবা আকলের সাথে "প্রান্ত বা উদ্দেশ্য বা ট্র্যানসেন্ডেনস" এর বুঝাপড়ার কিছুই নেই। (ends, purpose, transcendence)। তার "ধ্যান" এর ২৮তম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, "স্রষ্টা কেনো একটি কাজ করেছেন", এই প্রশ্ন করা বৃথা; বরং প্রশ্নটা হওয়া উচিত "তিনি এটা কীভাবে করেছেন।" দেকার্তের পর থেকে পাশ্চাত্য "কেনো" প্রশ্ন করা বন্ধ করে দিয়েছে। একটি পারমানবিক বোমা কীভাবে বানায়? প্রশ্ন হবে এটা। তবে কখনোই এটা নয় যে, "কেনো একটি পারমানবিক বোমা বানাতে হবে?"